বাংলা ও বাংগালীর আত্মপরিচয়ে ১৬ই ডিসেম্বর

দিলরুবা শাহানা

আত্মপরিচয় নিয়ে বর্তমান সময়ে মানুষ কিছুটা উদ্বিগ্ন। এই বিশ্বায়নের যুগে এমনটা হওয়ার কথা ছিল কি? বিশ্বায়নের যুগে মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা বাড়াটাই ছিল আদর্শিক। বাস্তব তুলে ধরে উল্টা চিত্র। অসহিষ্ণুতার ঘৃনা, বৈরী পরিবেশে মানুষ বিপন্ন। তাই নিজের টিকে থাকার স্বার্থেই, আপন অস্তিত্বকে জানান দেওয়ার জন্যই মানুষ আত্মপরিচয় খুঁজে ফেরে ও নানা ভাবে তা তুলে ধরে।

টুপি(টুপিরও নানান নকশা ও মাপ রয়েছে), টিকি, লম্বা চুলদাড়ি মানুষের অন্তরে লালিত বিশ্বাসের ও আচারব্যবহারে চর্চিত অভ্যাসের কথা বলে, এতে ঠিক আত্মপরিচয়টা ওই ভাবে বিবৃত হয় না।

ঘটনাক্রমে এক সেমিনারে দু'জন মানুষের সঙ্গে দেখা। একই মাপের টুপি পরা তা ক্লিপ দিয়ে আটকানো ফর্সা, দীর্ঘদেহী, অত্যন্ত ভদ্র, শিক্ষিত মানুষ সাথে। এক জন হ্যান্ডশেক করে বললেন ' I am Karl Goldberg, from America'

অন্যজন একই ভাবে হাত মিলিয়ে বললেন 'I am Eric Cohen, from Israil' ।

দু'জনই ইংরেজীতে কথা বলছেন, তবে উচ্চারণের মাঝে অবশ্যই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ঐ টুপিওয়ালা দু'জনের বাহ্যিক অবয়ব একই রকম প্রায় এবং টুপি তাদের লালিত বিশ্বাসের অঙ্গ, তবু তাদের আত্মপরিচয় ভিন্ন। দু'জনের দুটো দেশ রয়েছে, সেই ভূখন্ড তাদের পরিচিতি তুলে ধরে। এখানে আরও একটি বিষয় জানা জরুরী তা হল আমেরিকান সবাই ঐ টুপি পরে না। ইজরাইল রাষ্ট্রের নাগরিকরা সবাই ঐ টুপির বিশ্বাস ধারন করেনা ফলে ঐ টুপি তারাও পরেনা।

আরেক ঘটনা। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক সমরেশ মজুমদার এসেছেন। মেলবোর্ন এয়ারপোর্টে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কয়েকজন বাংলাভাষী সাহিত্যপ্রেমী তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত। বাইরে অবয়ব একই রকম এদের। কেউ বলছেন 'নমস্কার দাদা, কেমন আছেন?'

অন্য কেউ একজন বলছেন 'আদাব দাদা, পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো?

ভাষাটা বাংলাই বলা হচ্ছে তবে দু'জনের উচ্চারণের তফাৎ লক্ষণীয়।

এয়ারপোর্টে উপস্থিত বাংলাভাষীদেরও আত্মপরিচয়ের সাথে নিজস্ব ভূখন্ড মিশে আছে। একদল ভারত রাষ্ট্রের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের বাংলাভাষী আরেকদল বাংলাদেশের বাংলাভাষী। একদলের জাতীয় পরিচয় তারা ভারতীয়, আর অন্যদলের পরিচয় এরা বাংলাদেশী। দেখা যাচ্ছে ভাষা এক হলেও আত্মপরিচয়ের জন্য নিজ ভূমির সাথে সম্পৃক্ততা পরিচিতির অঙ্গ।

বাংলাদেশী পরিচয় স্থাপিত হয়েছে ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়ের মাধ্যমে। নিজস্ব আত্মপরিচয়ের জন্য ভূখন্ড ও একটি পতাকা জরুরী। সেই ভূখন্ড ও পতাকা পাওয়ার জন্য যে ভূমির মানুষ যখন রক্ত

বিলিয়ে দিতে পিছ পা হয়না তখন তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ঠেকায় কার সাধ্য? আত্মপ্রতিষ্ঠিত জাতির পরিচিতি দেওয়ার মত থাকে নিজ ভূমি, থাকে নিজস্ব পতাকা ও নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি।

শুধুমাত্র ভাষা এক হলেই মানুষের পরিচিতি এক হবে তা নয়। ইউরোপে রাষ্ট্রগুলোর নাম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাষা থেকে উদ্ভুত। যেমন ইংলিশ ভাষার দেশ ইংল্যান্ড, পোলিশ ভাষার দেশ পোল্যান্ড, রুশভাষার দেশ রাশিয়া, রোমানিয়া ভাষার দেশ রোমিনিয়া। মোলদভা(পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত একটি স্টেট ছিল এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মার্ক শাগালের মাতৃভূমি) রাষ্ট্রের মানুষের ভাষাও রোমানিয়া তবে তাদের আত্মপরিচিতি তুলে ধরে তাদের স্বদেশ বা স্বভূমি। তারা পরিচিত হয় মোলদাভান নামে। ভাষা এক হলেই দুই ভূখন্ড এক হয়ে যাবে তা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়।

সহজ সরলভাবে এইটুকু বুঝি আমাদের নিজস্ব ভূখন্ড, নিজের পতাকা, আমাদের নিজেকে প্রকাশের জন্য নিজের ভাষা এইসব হচ্ছে আমাদের আত্মপরিচিতির মূল উপাদান।

যদি ভাষা বাঁচানোর সংগ্রাম না হত আত্মপরিচয় ধরে রাখা যেতো কি? রক্ত দিয়ে ভাষা রক্ষা করেছিল কারা? কবির লেখনী বলে(স্মৃতি থেকে লিখছি কবি খুব সম্ভবতঃ সুফিয়া কামাল)

‘মায়ের নয়নমণি, মায়ের বুকের আশা
বক্ষ রক্তে লিখে গেল বাংলা মোর ভাষা’।

তারপর হল দুঃশাসন থেকে মুক্তির জন্য লড়াই। নিজস্ব ভূমির স্বাধীনতা, নিজ পতাকা পাওয়ার মরণপণ শপথ। নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী নেতৃত্ব এবং সর্বস্তরের মানুষের চেষ্টা ছিল শপথ বাস্তবায়নের মূলশক্তি। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে সফল হল পতাকা উত্তোলন, অর্জিত হল মাতৃভূমির স্বাধীনতা।

হিটলার নিরপরাধ ইহুদীদের নিশ্চিহ করে নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উন্মাদনায় মেতেছিল আর পাকিস্তানের শাসকদল বাংগালীদের শেষ করতে চেয়েছিল নিজেদের কর্তৃত্ব শক্ত করার উদ্দেশ্যে। হিটলার অনেক বছর ধরে ইহুদী নিধনে তৎপর ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় পাঁচবছর পর্যন্ত সময়ে ৬কোটিমত মানুষ নিহত হন যার মাঝে ৬০লক্ষ ছিলেন ইহুদী। আর পাকবাহিনী মাত্র নয়মাসে ৩০লক্ষ বাংগালীর প্রাণপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের যুদ্ধের আন্তর্জাতিক আইন ভেঙ্গে হত্যা-ধর্ষন ও সীমাহীন বর্বরতা চালানোতে উদ্বুদ্ধ করেছিল যুদ্ধবাজদের নীতিহীনতা ও শুনা যায় সৈন্যদের মাদকনির্ভরতা।। আর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অত্যন্ত চতুরভাবে ধর্মকে হাতিয়ার করেছিলো হানাদার পাক বাহিনী। মেয়েদের উপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন কোন ধর্ম কি অনুমোদন করেছিল বলে শুনা গেছে কখনো? না কোন ধর্ম এই পাশবিক আচরণ অনুমোদন করে না। তবে ধর্মের নামে চালানো এই নয়মাসের যুদ্ধে ২লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন। সুফিয়া কামালের কবি হৃদয় হাহাকার তোলে

‘যাদুরা দিয়েছে প্রাণ, দুহিতারা সম্ভ্রম সম্মান,
মায়েরা উপাড়ি দিল হৃদপিন্ড...’*

ধর্মকে রক্ষার লড়াই করছে এই বুলি কপচিয়ে তারা সুযোগসন্ধানী একদল বাংগালী ধর্ম ব্যবসায়ীকে(তারা ধার্মিক নয়) সঙ্গীসাথী করে নিয়েছিল। বিজয়ের প্রাক্কালে ১৪ই ডিসেম্বর বাংলার বুদ্ধিজীবি হত্যার নৃশংস পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এদেরই সহযোগিতায় সূচারু ভাবে সংগঠিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যে মূল্য তার সবই কি ধরার ধূলায় হবে হারা’
কিছুই ধরার ধূলায় হারায় নি। কবিগুরু নবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন বাংলায় লিখে তবে তখন ব্রিটিশ কলোনীর এক কবি ছিলেন তিনি। তার প্রয়াণের পর উপমহাদেশ ব্রিটিশের কব্জা ভেঙ্গে বের হল।

তারপর অনেক রক্ত ঝরিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন এক ভূখন্ড প্রতিষ্ঠিত হল এবং কবিগুরুর ‘আমার সোনার বাংলা’ মর্যাদা পেল স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হল কবিগুরু তৎকালীন পূর্ববাংলার মাটিতে তার জমিদারীতে অবস্থানের সময়ে এই গানের সুর খুঁজে পেয়েছিলেন । ঐ মাটির সুরের অসাধারন মাধুর্য্য অনুধাবন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিত্বই প্রয়োজন ছিল। মনে বোধ জাগে লাল সবুজ পতাকার উত্তোলনের সাথে সাথে অনুরণন তোলার জন্য কবিগুরুর বানী ও গগন হরকরার সুর ছিল ব্যাকুল অপেক্ষায়। এবং এই বিষয়টি গভীর বেদনা ও গর্বের সাথে বলতে হয় যে নারীর সম্ভ্রম বিসর্জন, বীরের রক্ত ক্ষরন ও বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণদান এই অপেক্ষার অবসান করেছিল।

*সুদূর আমেরিকা থেকে এই কবিতাটি পাঠিয়ে সহযোগিতার জন্য কবিপুত্র সাজেদ কামালের প্রতি কৃতজ্ঞ